হঠাৎ বুকে চাপ-প্যানিক ডিজঅর্ডার নয়তো ?

ডা. মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সহকারী অধ্যাপক
জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট
যোগাযোগ:delowarnimh@yahoo.com

রুবেলের বয়স ২৫ বছর। বাবার ব্যবসা দেখাশুনা করেন। কোনো ঝামেলা নেই। তারপরও হঠাৎ মাঝে মধ্যে তার বুক ধড়ফড় করা শুরু হয়। নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হয় তখন। এর সঙ্গে যোগ হয় হাত-পা অবশ হয়ে আসা, বুকে ব্যথা করা। ক্রমশ তার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছিল। মনে হয় এখনই মরে যাবে। এই ধরণের রোগীরা একটার পর একটা ইসিজি আর ইকোকার্ডিওগ্রাম করতে করতে তার চিকিৎসা ফাইল অনেক বড় করে ফেলেন। ডাক্তারও বদলাতে থাকেন তার রোগ ধরতে পারছে না বিধায়। এর মধ্যে রোগীর গায়ে কিন্তু বড় অসুখের সিল পড়ে গেছে। আর আত্মীয়স্বজনরা বলতে থাকে ওকে কোনো বড় কাজে দিও না। ওর বড় জটিল অসুখ। আসলে এটি একটি টেনশন বা অস্থিরতা গ্রুপের রোগ যাকে আমরা প্যানিক ডিজঅর্ডার বলে থাকি।

রোগীদের ভাবনাঃ

১. তার হার্টের অসুখ এজন্য বারবার ইসিজি ও ইকোকার্ডিওগ্রাম করে বেড়াচ্ছে। ২. মাথা ঝিমঝিম করছে-মানে স্ট্রোক করে ফেলবে। ৩. হাত-পা অবশ হয়ে আসছে মনে হয় প্যারালাইসিস হয়ে যাবে। ৪. যে কোনো সময় মৃত্যু হতে পারে।

ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের বেশি হয়। সব বয়সেই হতে পারে তবে ১৫-২৫ এবং ৪৫-৫৫ বয়সে বেশি হয়। বিপত্নীক বিধবা, স্বামী-স্ত্রী দু'জনে আলাদা হয়ে যাওয়া এ ধরনের পারিবারিক পরিস্থিতিতে বেশি দেখা দেয়। যদি কোনো শিশু ৫ বছরের আগে যৌন হয়রানির শিকার হয়, ছোটবেলায় বাবা-মাকে হারায় এবং বড় ধরনের মানসিক আঘাত পায় তাহলে তাদের মধ্যে প্যানিক ডিজঅর্ডার হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। এছাড়াও কম শিক্ষিত লোকদের মধ্যে এই রোগ তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা দেয়।

কীভাবে বুঝবেন যে প্যানিক ডিজঅর্ডার রোগে ভুগছেনঃ

১. হঠাৎ করে বুক ধড়ফড় করা, শ্বাস কষ্ট দেখা দেওয়া, মাথা ঝিমঝিম করা ।
২. দম বন্ধ হয়ে আসা, বড় বড় করে হাঁপানি রোগীর মত শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া।
৩. হাত-পা অবশ হয়ে আসা। শরীরের কাঁপুনি হওয়া।
৪. বুকের মধ্যে চাপ লাগা এবং ব্যথা অনুভব করা।
৫. এমনও দেখা গেছে, কোনো কোনো রোগী বলে হঠাৎ পেটের মধ্যে একটা মোচড় দেয় তারপর ওপর দিকে উঠে বুক ধরফর শুরু হয় সঙ্গে সঙ্গে হাত-পা অবশ হয়ে যায়। আর কথা বলতে পারে না।
৬. বমি বমি ভাব লাগে। পেটের মধ্যে অস্বস্তি বোধ লাগা ও গলা শুকিয়ে আসা।
৭. পেটের মধ্যে গ্যাস ওঠে, খালি গ্যাস গ্যাস উঠে এবং বুকে চাপ দেয়।
৮. দুঃশ্চিন্তা থেকেও মাথা ব্যথা হতে পারে কোনো কোনো রোগী বুকে ব্যথা ও হাত-পায়ের ঝিমঝিমকে হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ মনে করে প্রায়ই ছুটে যান হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে ডাক্তার দেখাতে।
৯. মৃত্যু ভয় দেখা দেওয়া মনে হয় যেন এখনই মরে যাবেন রোগ যন্ত্রণায়।
১০. নিজের প্রতি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলা।
১১. বারবার হাসপাতালে ভর্তি হওয়া / ইসিজি করা।
১২. দুরে কোথাও গেলে স্বজনদের কাউকে সাথে নিয়ে যায় যেন মাঝখানে অসুস্থ্য হলে ধরতে পারে।
১৪. রোগীদের মধ্যে ভয় কাজ করে এই বুঝি আবার একটি অ্যাটাক হতে পারে।
১৫. রোগের লক্ষণগুলো হঠাৎ করেই শুরু হয়১০ থেকে ২০ মিনিট পর কমে যায়।
১৬. সেফটি বিহেভিয়ার যেমন অ্যাটাকের সময় বসে পড়া, কোনো কিছু হাত দিয়ে ধরে সাপোর্ট নেওয়া ইত্যাদি লক্ষণ রোগীর মাঝে দেখা দেয়। যা কি-না হৃদরোগীদের মাঝে লক্ষণীয় নয়।

অন্য রোগের মধ্যেও প্যানিক অ্যাটাক হতে পারেঃ

১. বিষণ্নতা নামক রোগে দীর্ঘদিন ভুগলে
২. শুচিবায়ু নামক রোগেও এই রকম প্যানিক অ্যাটাক হতে পারে।
৩. নিছক সামাজিক ভয়ে।
৪. নেশা ছাড়ার পর।

কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণ হলোঃ

১. জিনগত কারণ যেমন আত্মীয়ের মধ্যে প্যানিক ডিজঅর্ডার থাকলে ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে।
২. সাইকোলজিক্যাল কারণ যেমন (বুক ধড়ফর) করা এসব হতে রোগীর মধ্যে আরো টেনশন তৈরি হয়। এই লক্ষণগুলো রোগীরা ভয়ংকর ভাবে গ্রহণ করে এবং জটিল অসুখ যেমন হার্টের অসুখ. স্ট্রোক ইত্যাদি ভেবে তার মধ্যে আরো টেনশন তৈরি হয়।

৩. শরীরে উদ্ভূত, বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ নিরসনের জন্য (সেরোটনিন গাবা ও নরএড্রেনালিন) রোগটি দেখা দিতে পারে।

৪. যাদের হার্টের ভাল্বের সমস্যা আছে তাদের এই রোগ হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়।

কী কী পরিণতি হতে পারে।

১. সময়মতো সঠিক চিকিৎসা না করলে, এ ধরনের রোগী ডাক্তারদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে সর্বস্বান্ত হয় এবং সব শেষে নিজে একজন হার্টের রোগী বলে কাজকর্ম ছেড়ে দেয়।

২. বিষণ্নতায় ভুগতে পারে।

৩. নেশায় জড়িয়ে যেতে পারে।

৪. এগোরোফোবিয়া নামক আরো একটি সমস্যার উদ্ভব হতে পারে। তখন রোগীরা বাইরে বের হতে, হাটবাজার রেস্টুরেন্ট ক্যান্টিন ইত্যাদি জায়গায় যেতেও ভয় পায়।

৫. ঘুমের সমস্যা হতে পারে।

৬. আত্মহত্যার চিন্তা মাথায় আসতে পারে।

৭. সর্বোপরি এই মানুষটি তার সমস্যার কারণে পরিবার সমাজ ও জাতির বোঝা হয়ে যেতে পারে।

চিকিৎসাঃ

* নিয়মিত ওষুধ খাওয়ানো। * রোগীকে আশ্বাস দেওয়া। * নির্দিষ্ট সময়ান্তে মনোচিকিৎসক ও চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানীদের শরণাপন্ন হওয়া। সঠিক সময়ে তাদের তত্ত্বাবধানে নিয়মিত ফলোআপের মাধ্যমে চিকিৎসা করলে এসব রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়।